ব্যষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথের দর্শন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই 'Unity' বা যোগ কথাটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানবসত্তা অথবা ব্যক্তির নিজের মধ্যে যে চেতনা অভিব্যক্ত হয় তাতে তিনি লক্ষ করেছেন বিভিন্ন স্তরের বিন্যাস এবং মনে করেছেন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌঁছোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব। 'সাধনা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দুইয়ের মধ্যে এই যোগ বা যুক্ত হওয়া সম্ভব কারণ মানুষই পারে তার চেতনার নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হতে। জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন সফল হয় তার চেতনার প্রসারণে, যখন তার আত্মা পরমাত্মাকে খোঁজে, বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েই সে সেই পরমকে পায়।

রবীন্দ্রসংগীতে এই কথাই ব্যক্ত হয় —

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।।

(গীতবিতান, ১৪০৭, পৃ. ১৫১)

চেতনার এই উচ্চস্তরে যাওয়ার জন্য মানুষের সাধনার প্রয়োজন। এইভাবে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব, যে-বিষয়ে ভারতবর্ষের অরণ্যবাসী ঋষিরাও বলে গেছেন।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা কখনোই মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে তার যোগ অনুভব করতে সাহায্য করে না। রবীন্দ্রনাথ এই অধ্যায়ে প্রাচীন গ্রিসের সভ্যতার কথা বলেছেন যা ইট, কাঠ, পাথরের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রিসবাসীদের এই সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথ কখনোই অনুমোদন করেননি। তিনি পশ্চিমের অনুকরণে এই বিচ্ছিন্নতা মেনে নেননি। তিনি প্রাচীন ভারতের আর্য অনুপ্রবেশকারীদের কথা স্মরণ করেছেন যারা ভারতবর্ষের বিস্তৃত অরণ্য ও প্রান্তরে তাদের বসতি স্থাপন

Scanned with CamScanner

করেছিল। তারা নানাভাবে অরণ্যের সহায়তা লাভ করে অরণ্যবাসী হয়েছিল, যে-কারণে ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব অরণ্যেই ঘটে তার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল।

অরণ্যচারী মানুষেরা অরণ্য সম্পদের দ্বারা নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। আমাদের মনে এ ধরনের চিন্তা জাগা খুবই স্বাভাবিক যে অরণ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে না। কিন্তু অরণ্যবাসীর পারিপার্শ্বিক বিচারে তা অমূলক বলেই প্রতিপন্ন হয়। আরণ্যক জীবন কোনোভাবেই মানুষের জীবনীশক্তিকে খর্ব করে না। "The Message of the Forest" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন নাটকে অরণ্যের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি অরণ্যচারী মানুষ কীভাবে অরণ্যের কাছে ঋণী সে প্রসঙ্গে লেখেন, "The forest gave them shelter and shade, fruit and flower, fodder and fuel; it entered into a close living relation with their work and leisure and necessity, and in this way made it easy for them to know their own lives as associated with the larger life.'

(*EWRT*, vol. 3, p. 386)

প্রকৃতির সপ্রাণ বৃদ্ধির অবিরত সংস্পর্শে থাকায় মানুষের অন্তর নিজের অর্জিত সম্পদের চারপাশে প্রাচীর তুলে আধিপত্য বিস্তারের কামনা থেকে মুক্ত ছিল। লোভ বা কামনা সংযত না হলে চেতনা সম্প্রসারিত হয় না। মানুষ নিজের অর্জিত সম্পদ নিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। আপনার অহংকে বড়ো করে দেখে নিজেকে আলাদা করে ভাবতে চায়নি। চেতনার প্রসারণে অহং-মুক্ত হয়ে পারিপার্শ্বিককে উপলব্ধি করে সর্বব্যাপী সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছে। 'সাধনা' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে 'spirit' বা প্রাণসত্তার উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে বিশ্বচৈতন্যের যে বিশাল সামঞ্জস্য তা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এই স্ফীত অহং বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীন ভারতীয় অরণ্যবাসী ঋষিদের এই সামঞ্জস্য উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে ভারতের জাগতিক সমৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও ভারতবাসী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছে অতীতের সেই প্রাচীন ঋষিদের যাঁদের আদর্শ ছিল কঠিন তপস্যায় নিয়োজিত থেকে আত্মোপলব্ধি।

Scanned with CamScanner

পশ্চিম পোষণ করে বিশ্বের প্রতি বৈরিতা কারণ, বিশ্ব তাকে কোনো কিছুই আপনা হতে দেয় না। বিশ্বের কাছ থেকে সে যা পায় সব কিছুই তাকে জোর খাটিয়ে আদায় করতে হয়। নগরবাসীরা প্রকৃতির থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে, কারণ তারা নিজেদের জীবন ও কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কৃত্রিম এক বিভাজন সৃষ্টি করে। ভারতীয় মানসিকতা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী, তার কাছে বিশ্বজগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করে এক পূর্ণ সত্য। এই সত্য কী ধরনের? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেন — 'Its truth is not the mass of materials, but their universal related-ness'. (Rabindranath Tagore, "Construction Versus Creation", *EWRT*, vol. 3, p. 401). পারিপার্শ্বিক যদি আমাদের একান্তভাবে বহিরাগত হত তা হলে তার সঙ্গে মিলিত হওয়া অসম্ভব হত। প্রকৃতির সঙ্গে সত্যভাবে সম্পর্কিত হওয়া সম্ভব হয় কারণ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যুক্তিবুদ্ধির যোগ আছে। তাই মানুষ তার নিজের প্রচেষ্টায় প্রকৃতির কাছ থেকে তার সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম হয় যা তার প্রয়োজন মেটায়, যদিও তার কাছে প্রকৃতি বা জগৎ শুধুমাত্র প্রয়োজনের জগৎ নয়। যে পূর্ণ সত্যলাভের জন্য মানুষ অগ্রসর হয় তা বস্তুজগতের মধ্যে সর্বজনীন সম্পর্কস্থাপনের উদ্দেশ্যে।

রবীন্দ্রদর্শনে সামঞ্জস্য বা harmony কথাটি বারবার এসেছে যার দ্বারা তাঁর দর্শনে যুক্ত হওয়ার যে কথা রয়েছে তা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের কাছে এটি একটি উপলব্ধ সত্য যে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে এবং সে কারণেই মানুষ প্রকৃতিজাত বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করতে সক্ষম হয়। মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে যখন সে তার এবং বিশ্বজগতের শক্তির মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তা খুঁজে পায়। পরিশেষে মানুষের উদ্দেশ্যে ও প্রকৃতির উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালায় "প্রকৃতি" শীর্ষক ভাষণটিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাদের সাধনা তারা শক্তি লাভ করে, তারা ঐশ্বর্যশালী হয়, তারা রাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে। শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলেই, অনেকের সঙ্গে মিলতে হয়। এই মিলন-সাধনের উপরেই শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে।' (র-র ১২, পৃ. ১৬২-৬৩)।

Scanned with CamScanner

পশ্চিমে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত। সেখানকার মানুষের চোখে যা-কিছু আমাদের জ্ঞান বা নীতিবিষয়ক তা-ই হয়ে ওঠে উৎকৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এর প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেন Shakespeare-এর নাটকের বিষয়বস্তু যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যোগের অভাব লক্ষ করা যায়।

'It cannot be said that beauty of nature is ignored in his writings; only he fails to recognize in them the truth of the interpenetration of human life and the cosmic life of the world'. ("The Message of the Forest", *EWRT*, vol. 3, p. 397). ভারতীয় মনন কিন্তু এভাবে চিন্তা করে না এবং নির্দ্বিধায় প্রকৃতির সঙ্গে এবং অন্য সকলের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করে নেয়।

ভারতীয় চিন্তায় সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাপারে যে মূল যোগের কথা ভাবা হয়েছে তা শুধুমাত্র দার্শনিক চিন্তা নয়, মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কর্মে এবং অনুভবে এই সামঞ্জস্যকে উপলব্ধি করা। মানুষ তার চেতনাকে ধ্যানে, উপাসনায় নিয়ন্ত্রিত জীবনে এমনভাবেই পরিশীলিত করে তোলে যে সবকিছুর মধ্যে সে আত্মিক সম্পদ খুঁজে পায়। মাটি, জল, আলোক, ফল, ফুল তার কাছে শুধু প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়, এদের মধ্য দিয়ে সে সেই পরম উৎকর্ষ লাভ করে। ভারত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছে যে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের একটি বিশেষ অর্থ আছে; মানুষ তার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সঞ্জীবিত হয়ে একটি চেতনসম্বন্ধ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবে। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নয় মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে প্রেমের শক্তি দিয়ে যা মানুষকে দেবে আনন্দ এবং শান্তি। মানুষের জীবন যদি প্রেমহীন হয় তা হলে তা অর্থহীন হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ এমন অবস্থা কল্পনা করে ঈশ্বরের কাছে এই প্রশ্ন রাখেন—

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে?
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন-হাওয়া গোপন কথা জানায় কানে কানে?

(পৃ. ২০৬)

Scanned with CamScanner